নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী পশ্চিমবঙ্গে ভোটার বানাবার রাজনীতির ইন্তেকাল

প্রতিম বসু

পূর্ব-কথন

আমার মা ১৯৫৬ সাল নাগাদ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে আসেন। তার আগে অবশ্য মা ভারতেই ছিলেন। কথাটায় একটু মার-প্যাঁচ আছে। একে তো ১৯৪৭ সাল অবধি দেশটা একই ছিল। তার ওপর মা বড় হয়েছে বিহারের ভাগলপুর শহরে। মা-র বাবা, অর্থাৎ আমার দাদু তদানীন্তন পূর্ববঙ্গের রাজশাহী জেলার সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। স্কুলজীবন শান্তিনিকেতনে। এরপর কলকাতায় ডাক্তারি পড়া শেষ হলে, জীবিকার সন্ধানে ভাগলপুর। মা-র শিশুবেলা এখানেই কেটেছে। ছুটিতে দেশের বাড়ি— রাজশাহী। সে সময়ে ভাগলপুরে আরেকজন উঠতি বাঙালি ডাক্তার ছিলেন, দাদুর সহপাঠী— বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক 'বনফুল'।

এর পরের অধ্যায়টা গল্পের মত না। ডাক্তারির সঙ্গে সঙ্গে দাদু সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে জেল খাটেন। ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি, অশক্ত শরীরে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে সপরিবারে 'দেশের বাড়ি' ফিরে যান, সেখানেই মৃত্যু। ততদিনে ভারত ভাগ হয়ে গেছে। স্বাধীন ভারত গড়তে চেয়ে, দাদু স্বাধীন পাকিস্তানে মারা গেছেন।

দিদিমা পাঁচটি সন্তানকে নিয়ে, পারিবারিক সম্পত্তি আর অদৃষ্টের ওপর ভরসা করে সে দেশেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুর সম্পতি দখলের[১] উল্লাস যখন হিন্দুর মেয়ে অবধি ধেয়ে আসছে[২], তখন আর ভরসা রাখতে পারেননি। দাদুর পরিচিতজনের ভরসায়, ক্লাস টেনের ছেলে আর ক্লাস নাইনের মেয়েকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেন— যদি তারা এদেশে কাজকর্ম জোগাড় করে পরিবারটাকে বাঁচাতে পারে।

১৯৪৭-১৯৭১ : উদাসীন ভারত ও হিসেবের ফাঁকি

যে সময়ের কথা বলছি তখনও ভারত ও পাকিস্তানের ভেতর ট্রেন চলত[৩]। তবে সব অর্থেই পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছিল। পাকিস্তানে প্রথম সেনা অভ্যুত্থান

(১৯৫১) ব্যর্থ হলেও মিলিটারি ও মুসলমান উগ্রবাদের ভেতর যোগাযোগ বাড়ছে, সঙ্গে বাড়ছে হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘুর ওপর অত্যাচার। পরিস্থিতি বেশি খারাপ হচ্ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে। ভারত ভাগের পর পশ্চিম-পাকিস্তানের শিখ ও হিন্দুরা বেশিদিন অপেক্ষা করেননি— উদ্বাস্তুর ঢল সাগরের ঢেউয়ের মতো আসে, কিন্তু ১৯৫০ সালের মধ্যে থেমে যায়। অন্যদিকে, পূর্বের হিন্দু ও অন্যান্য সংখ্যালঘু, বাস্তবতাকে মানতে অনেক সময় নিয়েছে, হয়তো কোনদিনই মানতে চায়নি। ফল ভয়াবহ। একদিকে সেনার দমন-পীড়ন, অন্যদিকে ক্রমাগত দাঙ্গার সাঁড়াশি চাপে পূর্ব-সীমান্ত দিয়ে ছিন্নমুলের স্রোত চলতেই থাকে।

১৯৫০ সালে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও নির্ভয়ে যাতায়াত সুনিশ্চিত করার জন্যে নেহরু-লিয়াকত চুক্তির ফলে দেশত্যাগী অনেক মুসলমান পরিবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসেন। এদের মধ্যে বাংলাদেশের পরলোকগত মিলিটারি শাসক জেনারেল এইচ এম এরশাদের[৪] নিকট আত্মীয়রাও আছেন। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের স্রোত ছিল শুধুই ভারতের দিকে।

নেহরু-লিয়াকত চুক্তির কার্যকারিতা নিয়ে বহু প্রশ্ন আছে। দেশভাগের পর ১৯৪৮ সালে, দুই দেশেই সীমান্ত পেরোবার জন্যে পারমিট চালু হয়। ১৯৫৩ সালে[৫] ভিসা-পাসপোর্টের জমানা শুরু হয়। যেহেতু জনগণনার হিসেবে পরিষ্কার যে দেশভাগের ফলে বেশিরভাগ মানুষ পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছেন সুতরাং হিন্দুরাই যে এর সব থেকে বড় শিকার সে নিয়ে সন্দেহ নেই। ভিসা পেতে গেলে ধরেই নেওয়া হত, দেশ ছাড়ছে, তাই কড়া প্রমাণ[৬] দিতে হত যে তার কাছে পাকিস্তানের কোন পাওনা নেই। একবার দেশ ছাড়লে আর ঢুকতে পারা মুশকিল। কারণ তাহলে দেশ-ত্যাগী[৭] বলে দাগিয়ে দিয়ে তার সম্পত্তি দখলে অসুবিধে হয়।

খুব সন্দেহ, বহু ছিন্নমূল মানুষ এসব এড়িয়ে দেশের সীমা পেরোত। কারণ অনেক। প্রথমত "পাসপোর্ট" শব্দটা এই বছর বিশেক আগেও বেশি লোক জানত না। আমার মার কাছে আমি কোন পাসপোর্ট দেখিনি। দ্বিতীয়, আজকের দিনেও মানুষ কাগজপত্র যোগাড় করতে হিমসিম খায়। সেদিন এসব কোথায় পেত? সোজা বা বাঁকা কোন পথই অবশ্য সহজ ছিল না। যতটুকু শুনেছি দেশভাগ ও দাঙ্গার সেই আবহে মানুষকে শেষ সম্বলটুকুও সীমান্তে রেখে অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াতে হত। খানসেনারা খেয়াল রাখত, হিন্দু মেয়েরা যেন শাড়ির কোঁচড়ে 'পাকিস্তানের সম্পত্তি' নিয়ে না পালায়[৮]।

আমেরিকার ডেটন ইউনিভার্সিটি থেকে ২০১২ প্রকাশিত প্রবন্ধে[৯] হৈমন্তী রায় বলেছেন, ভারতে ১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ব আইন আসার পরে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়ে। কাশ্মীর নিয়ে নাকানিচোবানি খেয়ে নেহেরু তখন 'নন-অ্যালাইন্ড মুভমেন্ট', হিন্দি-চিনি ভাই-ভাই ইত্যাদি বুনো-হাঁসের[১০] পেছনে ছুটছেন। তাঁর দৃষ্টি তখন অনেক দুরে। দিল্লিতে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন জোর কদমে চলছে। পূর্ব-পাকিস্তানের হিন্দুদের নিয়ে ভারত সরকারের আর মাথাব্যথা নেই। হৈমন্তী রায় লিখেছেন— ১৯৫৮ সালে উদ্বাস্তু শিবিরগুলো গুটিয়ে ফেলা হয়। অথচ একই সময়ে সরকার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ক্রমাগত ছিন্নমূল হিন্দুর আগমন নিয়ে কূটনৈতিক স্তরে পাকিস্তানের সঙ্গে তরজা করেছেন। ভারত সরকার নাকি চিন্তিত ছিলেন, বেশি হিন্দু এলে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার[১১] কাঠামো আঘাত পেতে পারে!

দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিদ্যার অধ্যাপক, অভিজিৎ দাসগুপ্ত তাঁর গবেষণায়[১২] দেখিয়েছেন, জহরলাল নেহরু সরকার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আশ্রয়ের সন্ধানে আসা বাঙালির ঠিক করে হিসেবই রাখেনি বা ইচ্ছে করে কম দেখিয়েছে, যাতে পশ্চিম-পাকিস্তানের ছিন্নমূলদের বেশি দেখভাল করা যায়।

কেন্দ্রের পুনর্বাসন দপ্তরের ১৯৭২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ এর ভেতর পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ৩৮ লক্ষ মানুষ পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন। অথচ ১৯৭১ সালের জনগণনায় পশ্চিমবঙ্গে ৭৩ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের কথা বলা হয়েছে (সে হিসেবও নাকি বাস্তবের থেকে কম)। এদিকে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের দেওয়া হিসেবের ভিত্তিতেই সরকার উদ্বাস্তুদের দেখভাল ও পুনর্বাসনের জন্যে টাকা বরাদ্দ করত। ফলে সরকারের টাকা পশ্চিম-পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের দিল্লিতে পুনর্বাসন দিতেই শেষ হয়ে যায়। বাঙালির জন্যে বরাদ্দ ফুটো পয়সা। দাসগুপ্তের হিসেবে পশ্চিমের ছিন্নমূলদের জন্যে মাথাপিছু কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ছিল পূর্বের চতুর্গুণ।

আসলে এই কম দেখানোর ব্যাপারটায় একটা চালাকি আছে। ১৯৪৮ সাল নাগাদ যখন দেশের দু-প্রান্তে মানুষের ঢল আছড়ে পড়ছে, সরকারি তথ্যে এদের "উদ্বাস্তু[১৩]" এবং "বাস্তুচ্যুত[১৪]" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ এই সময়ে সরকার "উদ্বাস্তু" এবং "বাস্তুচ্যুত" এই দুটি শব্দের বদলে "মাইগ্রেটেড" বা "পরিযায়ী" শব্দের ব্যবহার বাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্নবিদ্ধ নাগরিকত্ব

কিভাবে এই ফাঁকি সম্ভব হয়েছে, সে নিয়ে দাসগুপ্ত[১৫] একটা আন্দাজ দিয়েছেন ঃ সে আমলের আইন অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে ভারতে এলে তাকে প্রথমে "মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট" দেওয়া হত। এরপর দরকার উদ্বাস্তুর[১৬] প্রমাণপত্র। আর ১৯৫৫ সালে নাগরিকত্ব আইন আসার পরে, সেই আইন মোতাবেক স্থায়ী ভাবে থাকার আবেদন করার কথা। সেটা বোধহয় খুব কম লোকই করেছেন বা জানতেন। সরকারের তরফ থেকেও সেটা জানাবার কতটুকু উৎসাহ ছিল সন্দেহ। ১৯৫০-এর পর থেকেই উদ্বাস্তুর প্রমাণপত্র বিলিব্যবস্থায় ভাঁটা পড়ে। অনেকের মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটও ছিল না। অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে দেখলে এদের অনেকেরই নাগরিকত্ব প্রশ্নবিদ্ধ।

বলে রাখা দরকার, ভারত ভাগের সময় ঠিক হয়, দুই দেশের মানুষকে ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসের মধ্যে ঠিক করতে হবে তারা কোন দেশে থাকতে চান। তবে উদ্বাস্তুর ঢলের সামনে সে নিয়ে ভারত প্রথমে কড়াকড়ি করেনি। নেহরু-লিয়াকত চুক্তির (১৯৫০) পরে এনিয়ে বাড়াবাড়ি করা সম্ভব ছিল না। যাঁরা আসতেন তাঁরা সুলভ মূল্যে খাদ্যদ্রব্য নেবার জন্যে রেশন কার্ড পেয়েছেন, যা দেখিয়ে আবার ভোটার লিস্টে নাম তোলা যায়। প্রথম দিকে সরকার ও বিরোধী পক্ষে বাম দলগুলির কারোরই উদ্বাস্তুদের নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু ভোটার বাড়বে এই গন্ধে বাম এরপর উদ্বাস্তুদের দখল নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর সরকারের টনক নড়ে। ১৯৫১ সালে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি[১৭] তৈরি হয়। সরকার তখন জানায় ভোট দিলেই নাগরিকত্ব[১৮] মিলবে না।

আপাতভাবে এই থাকা না-থাকাতে সাধারণ উদ্বাস্তু জীবনে তেমন প্রভাব পড়েনি। তারা রেশন কার্ড, সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানার জমি দখল করে উদ্বাস্তু কলোনি, ক্যাম্প, হকারস কর্নার ইত্যাদি নিয়েই নতুন জীবনে ভেলা ভাসিয়েছিলেন। অনেকে চাকরিও পেয়েছেন। বেসরকারি ক্ষেত্রে সে যুগে তেমন কিছু কড়াকড়ি ছিল না। সরকারি হলে কাগজপত্রে একটু আধটু এদিক-ওদিক করা 'নিয়মের' মধ্যেই ছিল।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর দু'দেশের ভেতর সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটে। রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়। তখন আরেকটু বেশি এদিক-ওদিক করতে হয়েছে।

আর ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চের পর যাঁরা এসেছেন তাঁদের পুরোটাই ফাঁকি। মার খেয়ে আসা হিন্দু আর কাজের খোঁজে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢোকা মুসলমান সবাই 'অনুপ্রবেশকারী'। বিধি ব্যবস্থা আর সরকারি সদিচ্ছার অভাবে, ততদিনে রেশন কার্ড আর ভোটাধিকার নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর সুযোগ নিয়ে বাম দলগুলো ভোটের বাক্স ভরিয়ে ফেলে।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, ভারত তো ১৯৭১ সাল অবধি বাংলাদেশ থেকে আগতদের "নাগরিকত্ব" দিয়ে দিয়েছে। তাহলে ১৯৬৬ সালের আগতদের কেন কাগজপত্রে ফাঁকি দিতে হবে? আসলে এই ধারণাটাই একটা বড় ফাঁকি। প্রথমত ১৯৬৬ সাল থেকে আগত শরণার্থীদের কি হবে তা নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত নিতে নিতে ১৯৭১ পেরিয়ে গেছে। মাঝখানের সময়টায় দিল্লিতে কংগ্রেসের নেতারা গদির জন্যে মারামারি করছিলেন। শেষমেশ সবাইকে হটিয়ে ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। পূর্ব-পাকিস্তানের মার খাওয়া হিন্দুকে নিয়ে কে ভাবে মশাই? আর ১৯৭১ নাগাদ তো দলে দলে হিন্দু, মুসলমান সবাই অত্যাচারিত হয়ে এদেশে আসতে শুরু করল—হিসেবই বদলে গেল। ১৯৬৬ সালের উদ্বাস্তু কি ততদিন রেশনের চাল খেয়ে বেঁচেছিল? রুজি-রোজগার করতে গেলে তো কিছু প্রমাণপত্র দিতে হয়!

দ্বিতীয়ত পূর্ব-পাকিস্তানে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চরমে ওঠে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-এর ভেতর। দি ইস্টবেঙ্গল (এমারজেন্সি) রিক্যুজিশন অ্যাক্ট আর টেনান্সি অ্যাক্টের অপব্যবহার করে হিন্দুর সম্পত্তি দখল পূর্ব-পাকিস্তান গঠনের শুরু থেকেই হচ্ছিল। তাছাড়া দাঙ্গা, গায়ের জোর এসব তো ছিলই। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে, পাকিস্তান রাতারাতি শত্রু সম্পত্তি আইন (১৯৬৫) এনে হিন্দুদের সম্পত্তি দখল শুরু করে, সঙ্গে পাকিস্তান সেনা ও রাজাকারদের (পাকিস্তান সেনার অপকর্মের দোসর উগ্র মুসলমান) যৌথ আক্রমণ। সাঁড়াশি আক্রমণের চাপে হিন্দুরা দলে দলে ভারতে পালাতে শুরু করে। কিন্তু ভারত সরকার এদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি।

১৯৮৭ সালের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী[১৯] অনুযায়ী পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চের আগে যারা আসামে গেছেন কেবলমাত্র তারাই ভারতের নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। এই সংশোধনীতে বিশেষ করে

১৯৬৬ থেকে ১৯৭১-এর ভেতর আগতদের কথা বলা হয়েছে। (এই সংশোধনী আনা হয় ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর করা আসাম চুক্তির ওপর নির্ভর করে।) অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাকি ভারতে বসবাসকারী ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সালের ভেতর আসা ছিন্নমূলদের অধিকাংশের হাতে শুধুমাত্র একটি শরণার্থীর শংসাপত্র[২০] আছে। শরণার্থীর প্রমাণপত্র একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। শরণার্থী হলেই নাগরিক হয় না। দার্জিলিং পাহাড়ে বসবাসকারী তিব্বতি (বৌদ্ধ) শরণার্থীরা ভারতের নাগরিক নন।

তিব্বতিদের সঙ্গে পূর্ব-পাকিস্তানের শরণার্থীর ফারাক হল, তিব্বতিদের ভোট নেই। অথচ কি আশ্চর্য যোগসাজসে পূর্ব-পাকিস্তানের শরণার্থীরা অনেকেই ভোটার হয়ে গেছেন। ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৯ এবং ১৯৭৭ থেকে ২০১১-র বাম শাসন শরণার্থীকে ভোটার বানাবার চক্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রেখেছে বলেই মনে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অপদার্থতায় ১৯৫১ সালের পর জাতীয় নাগরিকপঞ্জির হালনাগাদ না করার ফলেই এতবড় অন্যায় সম্ভব হল। একদিকে কোটি কোটি লোক বেনিয়মে নাগরিক হয়ে, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতের ভোটে প্রভাব ফেলল — নাগরিকের মর্যাদা ক্ষুন্ন হল। অন্যদিকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে তাড়া খেয়ে আসা হিন্দু, যার এদেশে সাদর আমন্ত্রণ পাওয়ার কথা, সে বেনিয়মকে লুকোবার জন্যে কখনও বাম কখনো তৃণমূলের মত কোন না কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় বাঁচতে বাধ্য হল। ইতিহাস যেন এই অপরাধের ক্ষমা না করে।

কেউ কথা রাখেনি!

অন্যায়ের এখানেই শেষ নয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সেদিন পাকিস্তান বাহিনী ভারতীয় সেনার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তখন পশ্চিমবঙ্গ পালিয়ে আসা মানুষে (হিন্দু ও মুসলমান) থিকথিক করছে। যুদ্ধ শেষের পর বেশিরভাগ মুসলমান বাংলাদেশে ফিরে যান। সাধারণ ধারণা এবং সঠিক ধারণা, একটা বড় অংশের হিন্দু ভারতে থেকে যান।

তাহলে ১৯৮৭ সালের নাগরিকত্ব আইন সংশোধনীতে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরের বদলে মার্চ মাসের কথা এল কোথা থেকে? কারণ ঐ দিন শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন করার ডাক দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও মুজিবর রহমান ঠিক করে নিলেন ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে

ডিসেম্বরের ভেতর যারা ভারতে এসেছিলেন তারা সবাই সে দেশে ফিরে গেছে বা যেতে হবে। সুতরাং, সরকারি নিয়মে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৪ তারিখের পর আর কাউকে শরণার্থীর প্রমাণপত্র দেওয়া হয়নি। যারা থেকে গেল তাদের হিসেবে কারচুপি করতে হল।

গোটা ব্যাপারটা ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিরোধী। ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর, সংসদের উচ্চকক্ষে (রাজ্যসভা) নাগরিকত্ব বিল নিয়ে বিতর্কে বিজেপির সুব্রামনিয়ম[২১] স্বামী[২২] মনে করিয়ে দিয়েছেন যে ১৯৪৭ সালের ২৫শে নভেম্বর, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একটি প্রস্তাব পাস করে যাতে বলা হয়— "পাকিস্তান থেকে ভারতে যে সব 'অমুসলমান' ভারতে এসেছেন বা আসবেন তাদের রক্ষা করা ভারতের কর্তব্য।" জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী থেকে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং— কংগ্রেসের তাবড় তাবড় নেতা একই কথা, নানা সময়ে, নানা ভাবে বলেছেন।

কার লজ্জা?

লেখা শুরু করেছিলাম একটা পরিবারের বাঁচতে চাওয়ার গল্প দিয়ে। পরিবারটা বেঁচেছিল। কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সম্মানটুকু অটুট ছিল। হাওড়া স্টেশন, ক্যাম্প বা মার্কসবাদীদের ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকতে হয়নি। দাদুর পরিচিতজনেরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। ছোট ছেলেটা দেশের দূর প্রান্তে শ্রমিকের কাজ পায়। মেয়েটা যায় নার্সিং শিখতে। পড়া হলে চাকরি মিলেছে। তাতে ভর করে, বাকি পরিবার পূর্ববঙ্গের ইতিহাস মুছে ফেলে এদেশে এসেছে, তারাও আবার ছড়িয়ে পড়েছে দেশ ও বিদেশের নানা অঞ্চলে। তিন প্রজন্ম পরে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে, খালি পরিবারটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। জীবন, দেশ, স্বাধীনতা শব্দের মানেও বদলে গেছে।

সে প্রজন্মের খুব কম মানুষই আজ বেঁচে আছেন। আমার মাও আর নেই, কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন, ব্যক্তিগত কাগজপত্র নিয়ে সতর্ক থাকতেন। কারণ সেখানে বিস্তর জল। দাদুর যে বন্ধুরা মাকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছিলেন, তাঁরাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছু মিথ্যেকে সত্যি বলে চালিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে পরিবারটা রক্ষা পেয়েছিল। কিন্তু আদর্শবান পিতার সন্তান হিসেবে তার জন্যে মায়ের মনে কোথাও একটা লজ্জা বা কুণ্ঠা ছিল।

বড় হয়ে মনে হয়েছে, লজ্জা কার হওয়া উচিত ছিল, আমার মা-র, না 'স্বাধীন' ভারতের— যে ভারত সব জেনে বুঝেও ভাগ্যের ফেরে পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দুদের পাশে দাঁড়ায়নি? ধর্মনিরপেক্ষতার গালভরা কিছু বুলি আউড়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি, যারা পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কোটি কোটি হিন্দুকে বোঝা, মিথ্যুক ভাবত, বাঙাল বলত—তাদেরও কি লজ্জা হয়?

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ—সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে

গল্প কিন্তু বাকি আছে। মা-র ভারতে আসার আরও বিশ বছর পরে, অর্থাৎ সত্তরের দশকের শেষে, বাংলাদেশ থেকে আমার এক দাদা-স্থানীয় এদেশে আসেন। ইনিও অভিজাত পরিবারের ছেলে। বিজ্ঞানের উজ্জ্বল ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল। নতুন কিছু নয়। পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্তি চেয়ে সে দেশে বিক্ষোভের শুরুর কড়ি অনেকটাই এসেছিল পূর্ব-পাকিস্তানে থেকে যাওয়া হিন্দু পরিবারগুলোর কাছ থেকে। সে কারণেই বোধহয় এঁরাই প্রথম পাকিস্তানি সেনা আর রাজাকারদের খুন, জখম, ধর্ষণের শিকার হন। ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের সময়, সেই ইতিহাসের বীভৎসতা বার বার খবরের কাগজে উঠে এসেছে, বিশেষত বিএনপির প্রাক্তন মন্ত্রী ও ছ-বারের সাংসদ কুখ্যাত সাকা ওরফে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর[২৩] বিচারের সময়। পাকিস্তান সেনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হিন্দুর ওপর অত্যাচারে সাকা ছিল অদ্বিতীয়।

তবে এসব করে আখেরে হিন্দুদের যে কোন লাভ হয়নি, সে কথা তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৯৭১-এর যুদ্ধে পাকিস্তান সেনা, ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পরেই বাংলাদেশ জুড়ে রটে গেল ভারত, স্বাধীন বাংলাদেশের ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে। শেখ মুজিব ধর্ম-নিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়তে চেয়েছিলেন; ভারত, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ সহজ করে দিয়েছিল— এসব সত্যি। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভেঙে আলাদা দেশ গড়ার ইতিহাসটা আরো বেশি সত্যি। এবং তার শিকড় অনেক গভীরে।

১৯৪৭-এর প্রায় সাত দশক আগে ১৮৮৮ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান "দ্বিজাতি-তত্ত্ব প্রচার করেন"[২৪]। রাজনৈতিক ক্ষমতা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের

বহুদিনের দাবি ছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের আনা বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে রবীন্দ্রনাথের রাখীবন্ধন উৎসব এবং সে প্রস্তাব রদ হওয়ার কথা সবাই জানে। যেটা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত মানুষ জানতে চায়নি, বা জেনেও না জানার ভান করেছে সেটা হল, বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়াটা পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজ মেনে নিতে পারেনি।

এর ঠিক পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৬ সালে ঢাকা শহরে মুসলিম লীগের পত্তন হয়। ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে মুসলিম লীগের সভাপতির ভাষণে কবি ইকবাল এর আরও বিস্তারিত রূপ দেন। তাঁর মতে, জাতিগত ভাবে হিন্দু ও মুসলমান আলাদা এবং "জাতীয় ভিত্তিতে যদি এমন কোন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা হয় যেখানে ইসলামের নীতিসমুহ স্থানচ্যুত হবার সম্ভাবনা আছে, তা একজন মুসলমানের পক্ষে কোন ভাবেই মেনে নেওয়া সম্ভব নয়"। ইকবালের মতে এটা নাকি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা নয়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর সম্মেলনে এই প্রস্তাব চূড়ান্ত হয়। প্রস্তাব পেশ করেন শেরই-বাংলা ফজলুল হক। কফিনে শেষ পেরেকটা ঠোকেন মহম্মদ আলি জিন্না। পাকিস্তান প্রস্তাবের মুখরায় উনি বলেন ঃ "মুসলিম ভারত এমন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করতে পারে না যেখানে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে, কারণ তা হবে হিন্দুরাজ।"[২৬]

মোদ্দা কথাটা হল। দেশভাগের পর ভারত ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পথে হেঁটেছে, এই মুহূর্তে পাকিস্তানের থেকে বেশি মুসলমান ভারতে থাকে, এসব কথা সত্যি হলেও তাতে দেশভাগের কলঙ্কজনক ইতিহাসটা মুছে যায়নি। সুতরাং ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ পথ চলার শুরুতেই ধাক্কা এল। হিন্দুরা আবার ভীত হল। আর ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর তো বাংলাদেশ আবার হল ইসলামিক রাষ্ট্র আর হিন্দু এবং হিন্দু-গরিষ্ঠ ভারত হল প্রকারান্তরে শত্রু।

মুজিবর রহমান পাকিস্তান আমলের শত্রু সম্পত্তি আইনের বিলোপ ঘটিয়ে নতুন একটি আইন এনেছিলেন— অর্পিত সম্পত্তি আইন[২৭]। কিন্তু নাম বদল হলেও কাজে বদল হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বরকত এনিয়ে বিস্তর গবেষণা করেছেন ও বই লিখেছেন। বরকত তাঁর সম্পাদিত গবেষণা গ্রন্থে[২৮] দেখিয়েছেন, পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের হাত থেকে কয়েক মিলিয়ন একর জমি দখল হয়েছে। ২০১৬ সালে তাঁর একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে

বরকত বলেন ধর্মীয় নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণের মুখে ১৯৬৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ১.১৩ কোটি হিন্দু পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ছেড়েছেন। অর্থাৎ গড়ে বছরে ২.৩ লাখ হিন্দু সে দেশ ছেড়ে যান। নিশ্চিন্তভাবেই বলা যায় হাতে গোনা কয়েকজন বাদ দিলে প্রায় সবাই ভারতে এসেছেন। এবং অবৈধ নাগরিকের জীবনযাপন করছেন বা অবৈধ ভাবে ভারতের নাগরিক হয়েছেন। তাদের কি আরেকটু সম্মান প্রাপ্য ছিল না? বরকত নিজেও একটা দৈনিক দেশত্যাগের হিসেব দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তান আমলে রোজ ৭০৫ জন হিন্দু দেশ ছাড়তেন। ১৯৭১-৮১ ও ১৯৮১-৯১ সালের মধ্যে সে সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে দৈনিক ৫১২ এবং ৪৩৮। লক্ষণীয়, ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ বাংলাদেশ প্রকারান্তরে সামরিক শাসনে ছিল। বরকতের মতে হিন্দুদের দেশ ত্যাগের সংখ্যা কমলেও থামেনি এবং এই ধারা বজায় থাকলে "আগামী ৩০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হিন্দু-শূন্য[২৯] হয়ে যাবে"।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, শেখ মুজিবর কন্যা শেখ হাসিনা এই আইনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়েছেন। নতুন আইন বানিয়েছেন যাতে হিন্দুরা সম্পত্তি ফেরত পায়। (তবে আমলা মহলের অনিচ্ছার কারণে তাতে কাজের কাজ এখনও তেমন কিছু হয়নি।) তাছাড়াও হিন্দুদের সামাজিক অবস্থানে বদল ঘটাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। সরকারি উচ্চ-পদে অনেক হিন্দু উঠে এসেছেন। কিন্তু ততদিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। স্বাধীনতার সময়ে পূর্ববঙ্গে হিন্দু ছিল ৩০% এখন ১০%-এর নিচে। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা কিন্তু স্বাধীনতা-পূর্ব জায়গাতেই ফিরে এসেছে। প্রায় ৩০%।

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণে হিন্দুদের পক্ষে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন অবলম্বন নেই। আর সে দেশের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই শোনা যাবে, লীগের পান্ডারা কেমন ডান্ডা মেরে সম্পত্তি দখল করে। ব্যাপারটা শুধু সম্পত্তিতে নেই। হিন্দুর ওপর অত্যাচার নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা যে শুধু বড়লোক হিন্দুর ওপর হয় তা নয়। গরিবের ওপরেও হতে পারে। আর তার ফলাফল একই। একজনের অণ্ডকোষ[৩০] কেটে নিলে গোটা গ্রাম, সমাজ বার্তা পায় — ভেগে পড়, নইলে বিপদ বাড়বে।

ভৌগোলিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক যেভাবেই দেখুন না কেন, বাংলাদেশ থেকে হিন্দুর ভেগে পড়ার জায়গা একটাই— ভারত। আর তাকে সসম্মানে স্থান

দেওয়ার দায়িত্ব সেই ভারতের যে ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ মেনে নিয়ে কোটি কোটি হিন্দুর অস্তিত্ব সংকট ঘটিয়েছিল। কোন সংখ্যাতত্ত্বে প্রমাণ করতে পারবেন না যে, ১৯৪৭ সালের পর ভারতের মুসলমানেরা দলে দলে বাংলাদেশে গেছেন। উল্টোটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য। সেই সত্যের বীজ ১৯৪৭ সালেই আছে, তাই তার দায় ভারতকে নিতে হবে বৈকি। কোন বুদ্ধিতে তাকে ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে কাজের খোঁজে আসা বাংলাদেশি মুসলমানের সঙ্গে এক গোত্রে ফেলা যায়?

গল্পে ফিরে আসি, আমার পরিচিত ভদ্রলোক এভাবেই বাংলাদেশ থেকে ভেগে ভারতে এসেছেন। বিজ্ঞান পড়া চুলোয় গেছে। তবে উনি থেমে থাকেননি। জীবনের সঙ্গে লড়াই করে বেসরকারি ক্ষেত্রে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়ে ইদানিং অবসর নিয়েছেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাত এসেছে। স্ত্রী গত হয়েছেন। তবে ভদ্রলোক ভেঙে পড়েননি। একমাত্র সন্তানকে বড় করেছেন। সে এখন বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। দুজনেই একসঙ্গে থাকতে চায়। সন্তান তো তার কর্মজীবন ফেলে আসতে পারে না, সে চায় বাবাকে নিয়ে যেতে। বাবারও তাই ইচ্ছে। এই দুয়ের মাঝে প্রতিকূলতা একটাই দাদার পাসপোর্ট নেই।

কেন নেই? কেন আবার! আমার মা যা নিয়ে সারাজীবন সন্ত্রস্ত ছিলেন, দাদাও তাই। পাসপোর্ট দেনেওয়ালারা অনেক কাগজপত্র খতিয়ে দেখে। এসব করতে গেলে যদি কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরোয়? শিক্ষিত মানুষ তাই আইনকে ভয় পান। আইনের চোখে তো উনি অবৈধ অনুপ্রবেশকারী।

নাগরিকত্ব আইন ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঃ

আমার মা বেঁচে নেই। থাকলে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখটা মনে রাখতেন। যেমন আমার দাদাটি রাখবেন। কারণ এক চরম অন্যায় ইতিহাসের পরিসমাপ্তি এদিন ঘটল। ভারতের সংসদ নাগরিকত্ব আইনের যে নতুন সংশোধনী কার্যকর করেছে তাতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান— যা ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ ভারতের ম্যাপের অংশ ছিল, সেখান থেকে ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আসা, সমস্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘুকে (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও শিখ) বিনা বাক্যবায়ে নাগরিকত্ব প্রদানের অঙ্গীকার করে।

নতুন আইনে নাগরিকত্বের আবেদন করে অপেক্ষা করার সময়সীমা এগারো

বছর থেকে কমিয়ে পাঁচ বছর করা হয়েছে। এর মানে হল, বাংলাদেশের মুসলমান কিংবা শ্রীলঙ্কার হিন্দু, দুজনকেই আগের থেকে কম সময় অপেক্ষা করতে হবে। বাংলাদেশের মুসলমান কোন আলাদা সুবিধের দাবি করতে পারে না, কারণ সে ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র চেয়েছিল এবং পেয়েছে। যেসব হিন্দুরা ২০১৪ সালের পর এসেছেন তাঁদেরও পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে হবে।

হিন্দুদের সঙ্গে বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে যা যা হয়েছে, অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সঙ্গে আরও বেশি হয়েছে। বিশেষত শিখ, বৌদ্ধ— এরকম যে ধর্মের ওপর হিন্দু ধর্মের প্রভাব ঐতিহাসিক, তাদের সঙ্গে। বৌদ্ধ চাকমারা তাদের মাতৃভূমি চট্টগ্রামের পাহাড় থেকে ভারতের ত্রিপুরা বা অরুণাচল প্রদেশে কেন এল, কিংবা ঢাকার গুরুদ্বার শিখদের পবিত্র তীর্থ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে আজ কেন একজনও শিখ নেই সে ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন। আর বাংলাদেশে যা অত্যাচার হয়েছে তার বহু গুণ হয়েছে পাকিস্তানে এবং তালিবানি আফগানিস্তানে। তার প্রমাণ আছে সংখ্যায়। পাকিস্তানে হিন্দু আর প্রায় নেই বললেই চলে—হয় ধর্মান্তরিত, নয় দেশ ছাড়া।

এ প্রসঙ্গের শেষ করার আগে দুটো কূট প্রশ্নের জবাব দেওয়া দরকার। প্রথমত আইন মেনে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা তো আগে থেকেই আছে, তাহলে যে সব হিন্দুরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এল তারা আইনত এল না কেন? আগের আইনটা একটু পড়ে দেখুন তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন। আগের আইনে সবাইকেই কারণ দেখাতে হত কেন তারা নাগরিকত্ব চাইছেন। কি জবাব দেবেন এর? কি করে প্রমাণ করবেন কেন একজনের অণ্ডকোষ কেটে নিলে বা মহিলাকে ধর্ষণ করলে সবার চিন্তা হয়! কেন পরিবারেরা একে একে ভারতে আসে? বাংলাদেশ সরকার তো স্বীকার করবে না, যে হিন্দুরা অত্যাচারিত। তার ওপর ভারতে যেতে চাইছে জানলেই সামাজিক চাপ আরো বেড়ে যাবে। বৈদেশিক সম্পর্কের স্বার্থে ভারতের পক্ষেও এ নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করা সম্ভব নয়।

কিন্তু প্রমাণ হাতের কাছেই ছিল। পূর্ববঙ্গ আয়তনে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় দ্বিগুণ বড় আর ঐতিহাসিক ভাবে হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু হয়েও প্রায় ৭০% জমির মালিক ছিল। অর্থাৎ গড় হিসেবে পূর্ববঙ্গের হিন্দুর কাছে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর তুলনায় বেশি জমি ছিল। সেসব ছেড়ে, নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে, তারা কি

"চাঁদের পাহাড়"-এর শঙ্করের মতো স্বেচ্ছায় পশ্চিমবঙ্গ ও ভারতে জীবনধারণের অভিযান করতে এসেছিল? নাকি কাশী-বিশ্বনাথের ঘাটে বেদান্ত নিয়ে আলোচনা করবে বলে এসেছিল এবং আসছে?

দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল, নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে কি প্রমাণ হয় যে ভারত আর ধর্মনিরপেক্ষ রইল না? অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, ক্রিশ্চানদের নাগরিকত্ব দিলে মুসলমানদের কেন নয়? অনেকে তো আরও এক পা বাড়িয়ে আরাকান (মিয়ানমার)-এর রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব চেয়েছেন। রোহিঙ্গারা কট্টর মুসলমান। একসময়ে চেয়েছিল, আরাকান সমেত পূর্ব-পাকিস্তানে ঢুকে পড়বে। এ নিয়ে মিয়ানমারে (তখন নাম ছিল বর্মা) বিস্তর গন্ডগোল হয়। এত সব ঝামেলায় না ঢুকে এটুকু বলাই যায়, যে এই সংশোধনী ভারত ভাগের ইতিহাসের ফলশ্রুতি, অতীতের ভুলের সংশোধন, সারা পৃথিবীর মানুষের দায়িত্ব নেবার জন্যে নয়। শ্রীলঙ্কায় হিন্দু আছে। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। থাইল্যান্ড ও মিয়ানমারে বৌদ্ধরা সংখ্যাগুরু। নতুন আইনে এদের কোন বাড়তি সুবিধে দেওয়া হয়নি।

আরও বড় যুক্তি আছে। নতুন আইনে একবারও বলা হয় নি যে, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের মুসলমান নাগরিকত্ব পাবেন না। তাদের জন্যে এতদিন যা আইন ছিল তাই থাকছে। বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত লেখক তসলিমা নাসরিন নাগরিকত্ব পাবার লাইনে আছেন। পাকিস্তান থেকে কয়েক হাজার অত্যাচারিত আহমেদিয়া মুসলমান হত্যে দিয়ে আছেন। ভারত তো তাদের আবেদন অগ্রাহ্য করেনি। আরও এলে আসুন না। ২০১৫ সালে ছিটমহল বিনিময়ের[৩১] সময়ে ভারতের দিক থেকে একজনও বাংলাদেশে যাননি। কিন্তু বাংলাদেশের দিক থেকে হিন্দুদের সঙ্গে বহু মুসলমানও এসেছেন। একই নরেন্দ্র মোদী সরকার তাদের নাগরিকত্ব দিয়েছে। তাহলে এখন হঠাৎ বৈষম্যের অভিযোগ উঠছে কেন?

অবিভক্ত ভারতের কিছু মুসলমান হাঁড়ি আলাদা করেছেন, নিজেদের দেশ বানিয়েছেন এবং হিন্দু তাড়িয়েছেন। তারপরও নাগরিকত্ব আইনে বাড়তি সুবিধে দেবার যুক্তিটা আঁতেল কুযুক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

গণতন্ত্র মানে বকবকানি?

ইংরেজিতে বলে 'ইউনিভার্সাল ফ্র্যাঞ্চাইজ'। এর বাংলা করলে বলা যেতে

পারে, 'প্রতি নাগরিকের একটি ভোট'। সমানাধিকারের এই সংজ্ঞা প্রথম প্রয়োগ করে নিউজিল্যান্ড ১৮৯৫ সালে। এর পরের ধাপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে-পরে গণতান্ত্রিক ইউরোপে এই সমানাধিকার প্রয়োগ হয়। আমেরিকায় আসে আরো পরে। এর আগে গণতান্ত্রিক বিশ্বে সবার ভোটাধিকার ছিল না। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমিত ভাদুড়ি তার "ডেভেলপমেন্ট উইথ ডিগনিটি" বইয়ে বলেছেন যে সব বড় দেশে এই পদ্ধতির প্রয়োগ হয় সেখানে মাথাপিছু আয় ২৫০০ ডলারের বেশি ছিল। অর্থাৎ প্রথমে মানুষকে উৎপাদনের কাজে লাগিয়ে তার জীবনযাপনের মান বাড়ানো হয়েছে, এর পর এসেছে রাজনৈতিক মতামত দেবার স্বাধীনতা।

একটিই দেশ এই মডেলের বাইরে— ভারত। ১৯৪৭ সালে মাথাপিছু ১০০ ডলারের কম আয় সম্বল করে ভোটের সমানাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় ভারতে। আনন্দের বিষয় যে, চরম দারিদ্র কাটিয়ে উঠে সেই ভারত এখন বিশ্বের উঠতি শক্তি হিসেবে জায়গা করতে চাইছে। দুঃখের কথা হল, এই গণতন্ত্রের ঠেলা এখন সমাজের সর্বস্তরে সামলাতে হচ্ছে। সবাই সব ব্যাপারে মত দিচ্ছে, যেন আইন কানুনগুলো ফেসবুকের পাতা। আর এর চরম প্রকাশ দেখা যাচ্ছে নাগরিকত্ব আইন ও নাগরিক পঞ্জিকরণের মতো অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে।

আগেই বলেছি, ১৯৪৭-এ ব্রিটিশ-ভারত ভাগের সব থেকে বড় মুল্য দিয়েছে বাঙালি হিন্দু। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু এসেছে একলপ্তে এবং তাদের সরকার পুনর্বাসন দিয়েছে। বাঙালি হিন্দু পূর্ব-পাকিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে দশকের পর দশক ধরে নিপীড়নের শিকার হয়ে ভারতে এসেছে। কিন্তু ভারত তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি। উদ্বাস্তুরা ইসলামিক নিপীড়নের হাত থেকে বেঁচে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনি ভাবে তাদের নাম ভোটার লিস্টে তুলে ভোট পেয়েছে, সরকার বানিয়েছে। কিন্তু যাদের ভোটে জিতেছে তারা নাগরিকের সম্মান পায়নি। সরকারি ভাবে 'উদ্বাস্তু'র পরিচয়টুকুও সবার ছিল না। 'দেশত্যাগী', 'পরিযায়ী' ইত্যাদি নানা সংজ্ঞায় তাদের আটকে রাখা হয়েছে। অথচ এই মানুষগুলো কিংবা তাদের পূর্বপুরুষ অবিভক্ত ভারতে থাকতে চেয়েছিল, এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্যে লড়েছিল।

অনুপ্রবেশ, জনবিন্যাস ও ধর্মনিরপেক্ষতা

হিন্দু বাঙালির প্রতি ভারতবর্ষের সব থেকে বড় অবিচারের নিদর্শন হল আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তু আর অনুপ্রবেশকারীর তফাৎ ঘুচিয়ে দেওয়া। ১৯৭১ সালের পর ভারতবর্ষ বাংলাদেশ থেকে আগতদের স্বীকার করেনি। এর অর্থ, যারা এসেছে, যেমন আমার পরিচিত ভদ্রলোক, তারা সবাই অনুপ্রবেশকারী।

ঠিক একই সময়ে বাংলাদেশের মুসলমানেরাও অর্থনৈতিক কারণে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে আসতে শুরু করে। (এর আগে অবধি মুসলমান অনুপ্রবেশ কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব ভারত, বিশেষত আসামে সীমাবদ্ধ ছিল।) ২০১১ সালে সংসদে তাঁর ভাষণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মুল্লাপাল্লি রামচন্দ্রন বলেন "বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ভারতের কাছে একটি বড় সমস্যা[৩২]"। মন্ত্রী জানান ২০০১ থেকে ২০১১ সালের জুন মাস পর্যন্ত ১.৩৫ লক্ষ অনুপ্রবেশকারীকে আটকানো হয়েছে।

ভারত সরকার দ্বারা স্থাপিত দিল্লির 'ইন্সটিট্যুট অফ ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস', সংক্ষেপে আইডিএসএ-এর ২০১৬ সালের একটি গবেষণাপত্রে[৩৩] পুষ্পিতা দাস দেখিয়েছেন কিভাবে অনুপ্রবেশের কারণে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে হিন্দু-মুসলমান জনবিন্যাস বদলে গেছে। হিন্দু-মুসলমান জনবিন্যাসে পরিবর্তন সব থেকে বেশি চোখে পড়ে ১৯৯১ থেকে ২০১১ সালের জনগণনায়। এই সময়ের মধ্যে আসামে মুসলমানদের সংখ্যা বেড়েছে ২৮.৪৩% থেকে ৩৪.২%। গোয়ালপাড়ার মতো, নগাঁও, কাছাড় ইত্যাদি সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে এই জনবিন্যাসের পরিবর্তন আরও প্রকট। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত, উদ্বাস্তু হিন্দুদের আগমন সত্ত্বেও মুসলমান জনসংখ্যা মোটামুটি ২০%-এ আটকে ছিল। এর পর হঠাৎ করেই বেড়েছে। ১৯৮১ সালে ২১.০৫%; ১৯৯১ সালে ২৩.৬১%, ২০০১ সালে ২৫.২৫% এবং ২০১১ তে ২৭.০১%। বাম-আমল (১৯৭৭-২০১১) জুড়ে বৃদ্ধির হারটা খেয়াল করবেন ২১.৫% থেকে ২৭.০১%।

অর্থাৎ যে দেশে নেতারা পঞ্চাশের দশকে পূর্বপাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আগমনকে ভালো চোখে দেখেননি, কারণ তাতে নাকি ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পেতে পারে, সেই দেশে জনবিন্যাস উল্টো দিকে বদলেছে। এটাও কি ধর্মনিরপেক্ষতা? জনবিন্যাসে সাম্যতা রক্ষা সামগ্রিক শান্তির জন্যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না?

নাগরিকত্ব মেলে না, কিন্তু ভোটার কার্ড মেলে

সারা পৃথিবী জুড়েই মানুষ অর্থনৈতিক কারণে এদেশ থেকে ওদেশ পাড়ি দেয়। ভারতীয়রা দুবাই কি সৌদি আরব থেকে ব্রিটেন, আমেরিকা পর্যন্ত যায় টাকার খোঁজে। শিল্পের নামগন্ধ না থাকলেও কেরালার অর্থনীতি ফেটে পড়ছে শুধু মধ্যপ্রাচ্যের টাকায়। কিন্তু এরা কেউ সে দেশের ভোটার নয়। ভোটার হতে হলে আগে নাগরিকত্ব পেতে হয়। অনেকে অবশ্য লুকিয়ে থাকে। কিন্তু সব দেশই সন্ধান পেলে তাদের ভাগায়।

ভারত-বাংলাদেশ পাশাপাশি দেশ। ৪০০০ কিমি লম্বা সীমান্ত। তাতে অনেক ভৌগোলিক কারণে অনেক ফাঁক-ফোঁকর। তাই মানুষ আসবেই। সেটা খারাপ না। বাংলাদেশিরা, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের তুলনায় পরিশ্রমী। কম টাকায়, বেশি কাজ করে। বর্ষা ভালো হলে বর্ধমান জেলায় চাষের শ্রমিকের আকাল পড়ে। তখন বাংলাদেশের শ্রমিক বাঁচায়। কথা বললে টের পাওয়া যায়, কলকাতা কি গৌহাটি শহরের অনেক ছুতোর, মিস্ত্রি, ড্রাইভার, রিকশাচালক বাংলাদেশি। এরা না থাকলে অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাবে।

মুশকিল হল, এরা ভারতে ভোটও দেয়। ভারত সরকার যখন বাস্তবতা থেকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছিল, নাগরিকপঞ্জির হালনাগাদ করেনি—রাজনৈতিক দলগুলো তখন সোনার খনি বার করে ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাম প্রথমে হিন্দু উদ্বাস্তুকে ভোটার বানিয়েছে। তারপর বাংলাদেশ থেকে আসা মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর নামও ভোটার লিস্টে ঢুকিয়েছে। বামকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি নিশ্চিত, যে কোন সুযোগসন্ধানী দল এ কাজটাই করত। আসামে কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৫ সালের রক্তক্ষয়ী আসাম আন্দোলন এ কারণেই হয়েছিল।

অসমীয়ারা তবু জনবিন্যাসের পরিবর্তনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সচেতনতা গড়ে তুলতে পেরেছে। পশ্চিমবঙ্গে সেটুকুও হয়নি। কে করবে? মার খেয়ে আসা হিন্দু আর কাজের খোঁজে আসা মুসলমান দুজনেই আইনের চোখে 'অনুপ্রবেশকারী'। দুজনকেই একই দল ভোটার বানিয়ে নাগরিকের সুবিধে দিচ্ছে। আগে দিয়েছে বাম। তারপর নিশ্চয়ই তৃণমূল দিয়েছে। নইলে নদিয়া, উত্তর ২৪-পরগনায় বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু-মতুয়ারা কোথায় যেত। এদের

অনেকেই ১৯৭১ সালের পর এসেছেন। নির্বাচনে জেতার এমন মোক্ষম ফর্মুলা থাকলে কে আর আসল নাগরিকের কথা ভাবতে যায়। কাঁড়ি কাঁড়ি ট্যাক্স দিলে কি হবে, আমার বাড়িতে কলকাতা কর্পোরেশন পানীয় জল সরবরাহ করে না। সেটা যায় বাংলাদেশ থেকে আসা লোকজনের ঘরে। নেতারা বিনয়ের ঝাউগাছ হয়ে বলেন— আপনাদের জন্যেই তো ক্ষমতায় এসেছি।

এই চক্র এবার বন্ধ হওয়া দরকার। আর তার জন্যেই দরকার নাগরিক পঞ্জিকরণ। নাগরিক পঞ্জি তৈরি করে আসাম পথ দেখিয়েছে। এবার পালা হোক বাকি ভারতের। শুধু তাতেই হবে না। বাংলাদেশে এখনও অনেক হিন্দু আছে, আবুল বরকতের দেখানো বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে ভারতের এবার ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হওয়া দরকার। ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইনে যারা ২০১৪ সাল অবধি এসেছেন খালি তারাই সুবিধে পাবেন। এরপর যারা এলেন, আসবেন তাদের কি হবে? দেশে এখনও শরণার্থী আইন নেই। দরকার। দরকার ওয়ার্ক পারমিটের, যাতে পাশাপাশি দেশগুলো থেকে কেউ কাজের খোঁজে ভারতে এলে আইন মেনে থাকতে পারেন। আইন যত মানুষের প্রয়োজন মাফিক হবে, আইন মানার প্রবণতাও তত বাড়বে— এটাই ঐতিহাসিক সত্য। সমস্যাকে ফেলে রাখলে সমস্যা কমে না, শুধু বেড়ে যায়। ১৯৭১-এর পর চোখ বন্ধ করে বসে থেকে ভারতেরও তাই হয়েছে। আর পশ্চিমবঙ্গের কথা বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমবঙ্গের, দেশের স্বার্থে নাগরিক পঞ্জিকরণ :

গল্পটা এবার গোটানো দরকার। পূর্ববঙ্গ থেকে আসা বহু পরিবারের একজন হিসেবে বলতে পারি, নাগরিক পঞ্জিকরণ আর নাগরিকত্ব আইন একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কল্পনার পৃথিবীর বাইরে, দেশ তার নাগরিকের। কর্তব্য দু-তরফেরই আছে। নাগরিকের কর্তব্য দেশের আইন মানা, নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক সরকার আনা। আর সরকারের কর্তব্য তার নাগরিকের সব সুযোগ সুবিধে মেটানো। অন্য দেশের নাগরিকের কাছে তার দায় সীমিত এবং সেটাও নিজের নাগরিকের স্বার্থে হতে হবে।

বাংলাদেশ আমার প্রতিবেশী। সেখানে দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা গেলে আমি খাবার পাঠাব। নইলে তারা আমার দেশে আসবার চেষ্টা করতে পারে। নেপালে ভূমিকম্প হলে আমি আগে ত্রাণ পাঠাব যাতে চিন এসে মাতব্বরি না করতে

পারে। কিন্তু কলম্বিয়া কি মেক্সিকো নিয়ে ভারতের ততটা উৎসাহ থাকবে না। ট্যাক্স দেয় দেশের নাগরিক, তাই মাতব্বরি তো তারই হবে। গণতন্ত্রে তার কথাই সরকারকে শুনতে হবে।

কিন্তু যদি নাগরিকের সংজ্ঞায় গলদ থাকে, যদি বাংলাদেশ থেকে বেড়াতে এসে ভারতের নাগরিক হওয়া যায়, ভোট দেওয়া যায়, তাহলে সরকার কোন নাগরিকের কথা শুনবে? বাংলাদেশের নাগরিক যদি গোলমেলে পথে, অনেক সংখ্যায়, ভারতের নাগরিক হয়ে যায়, তাহলে অর্থনৈতিক থেকে রাজনৈতিক সর্বক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়বে। আজকের দিনে আরও বড় ভয় হল সন্ত্রাসবাদী যোগ। ভারতের গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর প্রাক্তন প্রধান সঞ্জীব ত্রিপাঠী ২০১৬ সালে "কার্নেগী ইন্ডিয়া"য় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে[৩৪] দেখিয়েছিলেন শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারীর ভেতর ফারাক করা কেন দরকার।

সারা ভারতের জন্যে তেমন বড় ব্যাপার না হলেও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম—এরকম রাজ্যগুলোতে সেই গোলমালটাই বেধেছে—আসল নাগরিক বনাম নকল নাগরিক।

আসামে ১৯৭১ সালের ২৪ শে মার্চ পর্যন্ত আসা লোকেদের ধরে, ১৯ লক্ষ এমন লোক পাওয়া গেছে যারা নাগরিকতার প্রমাণ দিতে পারেননি। এটা প্রাথমিক হিসেব। এর মধ্যে তিন লক্ষের ওপর লোক ঠিক করে কাগজ জমা দেননি। এক লক্ষের মতো মানুষ ভুলের শিকার হয়েছেন। বেসরকারি ভাবে বলা হচ্ছে অন্তত চার লক্ষ বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু কাগজপত্রের গন্ডগোলের কারণে আটকে গেছেন। ১০ লক্ষের মতো মানুষের নাগরিকত্ব আগে থেকেই প্রশ্নবিদ্ধ। তাঁরা কোর্টে কেস লড়ছেন। সব মিলিয়ে নতুন নাগরিক আইন কার্যকরী হবার পরে সংখ্যাটা অনেক কমে আসবে। নিশ্চিন্ত করে বলতে পারি, ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব আইন না থাকলে পশ্চিমবঙ্গে আসামের থেকে অনেক বেশি হারে হিন্দু জালে জড়াতেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, ১৯৫১ সালের পর ভারতে আবার নাগরিক পঞ্জি তৈরি হবে। কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিয়েছে, সারা দেশে ২০১৪ সালের মধ্যে ভারতে থাকা নাগরিকদের নিয়ে নাগরিকপঞ্জি তৈরি হবে। আমার মনে হয় না সেটা আসামের মতো করে করা সম্ভব। কারণ তাহলে পাঁচ কেন ১০ বছরেও শেষ করা অসম্ভব। নিয়মকানুন এখনও পরিষ্কার হয়নি। সংসদে কোন আলোচনাও হয়নি। কিন্তু যাই হোক, যখনই হোক, পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকপঞ্জি

চাই। বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দু ও মুসলমান নিয়ে এতদিন ধরে চলে আসা নোংরা রাজনীতির শেষ দেখতে চাই। তার সুদূরপ্রসারী ফল ফলবে প্রকল্প রূপায়নে, সরকারের নীতিতে। আমার দেওয়া ট্যাক্সের টাকা বারোভূতে খাবার দিন শেষ হবে। অঙ্কটা কম হবে না কিন্তু। রান্নার গ্যাস থেকে স্কুল, কলেজ, মায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় (পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জি সরকার এর নাম বদলে দিয়েছে) বাড়ি —গরিবের জন্যে ভারত সরকারের ভর্তুকির পরিমাণ বেড়েই চলেছে। ভর্তুকি দেওয়া হয় ট্যাক্সের টাকায়। টাকা বাঁচলে দেশের ভালো।

রাজনীতিতে এর ফল সুদুরপ্রসারী হবে। সরকার সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুরু দুজনের মতকেই শুনতে বাধ্য হবেন।

মুসলমানের ক্ষমতায়ন হবে

চারিদিকের গেল গেল রবের মাঝে শুনতে আশ্চর্য লাগলেও, পশ্চিমবঙ্গে দূর-ভবিষ্যতে মুসলমানের ক্ষমতায়নে ও হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ কমাতে নাগরিকপঞ্জি ভুমিকা রাখবে বলেই আমার ধারণা।

কারণটা বোঝা সহজ, এবং উদাহরণও হাতের কাছেই আছে— আসাম। অসমীয়া-জাতীয়তাবাদী রাজনীতি এতদিন ভাঁটির আসামের মুসলমান জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে প্রচার করত। এদের উন্নয়ন বিঘ্নিত হত। রাজ্যে নাগরিক পঞ্জিকরণ সম্পূর্ণ হবার পর আর পারছে না। আগামীতে আরও পারবে না। এবার মুসলমানের ক্ষমতায়ন হবে। অসমীয়া জাতীয়তাবাদের এটা বেশ দুঃসময়। আরেকরকম উদাহরণ আছে। সাধারণ ধারণা, ত্রিপুরাতে বাংলাদেশ থেকে হিন্দু বাঙালিরা এসে সেখানকার আদিবাসীদের সংখ্যালঘু করে ফেলেছে। নাগরিক পঞ্জি থাকলে বলা যেত এই ধারণা কতটা সত্যি। আরও বড় কথা হল, আগামীতে নতুন করে কেউ এসে ত্রিপুরাতে নাগরিক হতে গেলে রাজ্য-রাজনীতি সতর্ক থাকবে যেন আদিবাসীদের স্বার্থে না লাগে।

দুধ আর জল আলাদা হলে, পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানের সব থেকে বড় লাভ হবে তাকে ঘিরে সাধারণ ধারণার বদলের ভেতর দিয়ে। এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, অবাধ অনুপ্রবেশ ও ভোটার বানাবার মেশিনের কারণে তাকে ঘিরে সাধারণ মানুষের ধারণা বিরূপ হয়েছে। এতে সব থেকে বেশি ক্ষতি হয়েছে রাজ্যের পূর্ব-বাসিন্দা মুসলমানের। মনে করা হয়, নকল নাগরিকদের

অনেকেই বাংলাদেশ ও ভারত দু'দেশেরই ভোটার। ধারণার পেছনে কারণ হল, যে কোন একদিনে ভোটের সময়ে সীমান্ত পেরিয়ে যাতায়াতে অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। উল্লেখ্য বাংলাদেশে কিন্তু নাগরিক পঞ্জি আছে। ভারতে নাগরিক পঞ্জি হলে এনাদের যে কোন একটা দেশ বাছতে হবে, নইলে দু'দেশের ভেতর তথ্য আদানপ্রদানে ধরা পড়ে যাবেন।

বাংলাদেশ ভারত সম্পর্কে প্রভাব :

পুরোন ঘা সারাতে গেলে, রোগী চেঁচাবেই। ভারতীয় গণতন্ত্রে আপাতত তেমনই চলছে। কেউ বলছে মুসলমানদের দেশ থেকে বার করে দেবে, জেলে পুরে রাখবে। বাংলাদেশে আলোচনা হচ্ছে, ভারত লাখ লাখ লোককে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। এগুলো তারাই করছে, যাদের আগে কুকর্ম করতে সুবিধে হচ্ছিল। সংবাদ মাধ্যমের ওপর বামেদের বিরাট প্রভাব। সুতরাং তারা গলা ফাটিয়ে ফেলছে। তার ওপর আছেন বুদ্ধিজীবীরা। এঁরা হচ্ছেন গণতন্ত্রের পেছনে অদৃশ্য লাঠি। কারো কাছে কোন জবাব দেবার নেই, কিন্তু পেছন থেকে দেশ চালাতে চান। এরা রটাচ্ছেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক নাকি গোল্লায় যাবে।

আসামে নাগরিক পঞ্জি তৈরি হবার সময়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেদের ভেতর বার বার কথা বলেছেন। দুজনেই বলেছেন বাংলাদেশের কোন ভয় নেই। আসামে বিজেপি সরকারও ফলাও করে একই কথা বলছে। বলারই কথা। কাউকে দেশ থেকে ফেরত পাঠাতে গেলে প্রথমে প্রমাণ চাই, সে কোন দেশের নাগরিক। কেউ ভারতের নাগরিক নন সেটা প্রমাণ হলেই, তার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রমাণ হয় না।

ভারত একটা বড় গণতান্ত্রিক দেশ। তাকে সভ্য পৃথিবীর নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। তার ওপর লাখ লাখ লোককে জেলে রাখতে হলে ভারতেরই পকেট ফাঁকা হবে। কোন বড় জেলে কয়েদি পিছু যতটা জমি থাকে, সে হিসেবে আসামের ১৯ লাখ লোকের জন্যে কলকাতা শহরের সমান সাইজের জেল বানাতে হবে। তারপর পশ্চিমবঙ্গ, দেশ! সুতরাং জেলে ঢোকানো কিংবা বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর গল্পগুলো একদম কাঁচা। তবে হ্যাঁ, নাড়াঘাঁটা পড়লেই বহু লোক পাততাড়ি গুটিয়ে নিজের দেশে পালাবে। নানা কাগজের

রিপোর্ট থেকে মনে হচ্ছে আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে তেমনটাই ঘটছে।

ভারতে যা হচ্ছে তা সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে। অনুপ্রবেশ বন্ধের জন্যে আমেরিকা থেকে ইউরোপ সবাই কোমর বেঁধে লেগেছে। এমনকি সন্দেহ হওয়ায় সৌদি আরব, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, ৪০০০০ হাজার পাকিস্তানিকে দেশে ফেরাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি আশাবাদী, যা ঘটছে তার থেকে ভালই হবে। যারা নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারবেন না, তাঁদের নিয়ে কি করা হবে সে সব সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। এদের ভোটাধিকার থাকবে না এটা স্পষ্ট। আমার মত হল, এদের সচিত্র প্রমাণপত্র দেওয়া হোক, যাতে সরকার নজর রাখতে পারে আর এরাও কাজকর্ম করে গ্রাসাচ্ছাদন করতে পারে। ১৯৮৭ সালের পর থেকে অনুপ্রবেশকারীর সন্তানের নাগরিকত্ব নিয়ে বিধি নিষেধ এসেছে। যদি তাতে একবারের জন্য মাপ করা হয় তাহলে বোধহয় ভালো হবে। সুপ্রিম কোর্টে এরকম একটা মামলা চলছে।

তথ্যসূত্র :

১. ভারত ভাগের পর অস্থিরতার সময়ে দুদেশেই সম্পত্তি দখল করার প্রবণতা ছিল। কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানের সঙ্গে ভাগাভাগিতে সম্পত্তি আদান প্রদানের বিধান ছিল। আসা-যাওয়ার পুরো প্রক্রিয়া সাত মাসের মধ্যে শেষ হয়। ফলে বেদনা চিরস্থায়ী হতে পারেনি। ঠিক উল্টোটা ঘটেছে পূর্ব-পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশে। পূর্ববঙ্গে যেহেতু হিন্দুর হাতে জনসংখ্যার নিরিখে অনেক বেশি জমি ছিল, তাই সামাজিক ক্ষোভ ছিলই। এর সঙ্গে যোগ হয় হিন্দুদের প্রতি প্রাতিষ্ঠানিক বিরূপতা। প্রথম দিকে সরকার নিজেই The East Bengal (Emergency) Requisition of Property Act-এর মতো নানা আইন করে হিন্দুদের সম্পত্তি বিভিন্ন অছিলায় দখল করতে শুরু করে। তাছাড়া Tenancy Act-এর যথেচ্ছ অপব্যবহার তো ছিলই। এরপর যত সময় গড়িয়েছে হিন্দুর পক্ষে অবস্থা ততই খারাপ হয়েছে। কফিনে শেষ পেরেকটা পোঁতা হয় ১৯৬৫ সালে শত্রু সম্পত্তি আইনের মাধ্যমে।

২. পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের আন্দোলন কিভাবে হিন্দু বিরোধিতা ও বিতাড়নে রূপান্তরিত হয় তা সব থেকে স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী উপন্যাস "নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে"-র প্রথম পর্বে।

৩. ১৯৬৫ সালে দ্বিতীয় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আগে অবধি দু-দেশের ভেতর ট্রেন চলত।

৪. এইচ এম এরশাদের জন্ম ও বড় হওয়া পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার দিনহাটা শহরে। ভারত ভাগের পর এরশাদের পরিবার পূর্ব-পাকিস্তানে গেলেও নেহেরু-লিয়াকত চুক্তির পরে সবাই ফিরে আসেন। কিন্তু এরশাদ পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। এরশাদের বৃহত্তর পরিবার এখনও দিনহাটা শহরে থাকেন। "The day Ershad slipped into Dinhata", The Hindu Business Line, December 16, 2014 https://www.thehindubusinessline.com/news/variety/The-day-Ershad-slipped-into-Dinhata/article20932050.ece

৫. Summary of Agreed Decisions regarding Indo-Pakistan Passport Arrangements. July 09, 1953, Ministry of External Affairs, India. https://mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/7617/Summary+of+Agreed+Decisions+regarding+IndoPakistan+Passport+Arrangements

৬. "Bengal borders and travelling lives" (2012), Anwesha Sengupta & Himadri Chatterjee, Mahanirban Calcutta Research Group . Pp 12 http://www.mcrg.ac.in/PP54.pdf

৭. Evacuee

৮. মহিলাদের শালীনতা লঙ্ঘন দেশভাগের এক অমোঘ পরিণতি। এসবের প্রমাণ সে সময়ে ঘরের মা-মাসির কাছে ভুরিভুরি ছিল। লজ্জার খাতিরে তারা সেকথা পাঁচকান করতেন না। সরকারি স্তরে এ নিয়ে কোনরকম হেলদোল ছিল বলে জানা নেই।

৯. Roy, Haimanti, "Partitioned Lives: Migrants, Refugees, Citizens in India and Pakistan, 1947-65" (2012). History Faculty Publications. Paper 21. Pg 14. http://ecommons.udayton.edu/hst_fac_pub/21

১০. এ প্রসঙ্গের অবতারণা আছে আমার লেখা "ভূ-রাজনীতির গোলকধাঁধায় পাকিস্তানের হাত থেকে কাশ্মীরের মুক্তি" প্রবন্ধে। "কাশ্মীর— ইতিহাস ও রাজনৈতিক বাস্তবতা" দে পাবলিকেশনস (২০২০)।

১১. Roy, Haimanti, ibid. Pg-14.

১২. "The puzzling numbers", Abhijit Dasgupta, South Asian Refugee Watch, Vol-2, No 2. December 2000.

১৩. Refugee

১৪. Displaced

১৫. "By defining 'old migrant' and 'new migrant' with the help of the year of entry the government had excluded many who came in between 1958 and 1964. Moreover, those who arrived with migration

certificate were officially migrants, but many of them were sent to camps as they were looking for relief and assistance. Thus migrants turned into refugees after their arrival in India," The puzzling numbers", Abhijit Dasgupta, South Asian Refugee Watch, Vol-2, No 2. December 2000.

১৬. Certificate of registration as refugee

১৭. National Registrar of Citizens

১৮. "In order to stem the continuing tide of migration, the Indian government fixed a time limit by which a refugee/migrant had to declare his/her intention to stay in India (this date was initially set at July 1948), and in early 1950's declared that inclusion within the electoral rolls would not guarantee automatic citizenship rights" Roy, Haimanti, ibid. Pg-14

১৯. এই সংশোধনী আনা হয় ১৯৮৫ সালে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর করা আসাম চুক্তির ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ চুক্তির এই অংশটি ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৭ সাল অবধি আইন বহির্ভূত ছিল। সংসদীয় গণতন্ত্রের কি অদ্ভুত নিদর্শন!

২০. Certificate of Registration as Refugee

২১. রাজ্যসভা ভাষণের ইউটিউব ভিডিও https://www.youtube.com/watch?v = 63MhNfnU7vA

২২. ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, ডিসেম্বর ১১, ২০১৯।
https://www.financialexpress.com/india-news/manmohan-singh-to-tarun-gogoi-all-wanted-citizenship-for-persecuted-hindus-subramanian-swamy-in-rajya-sabha/1791208/

২৩. Hanged Together, The Daily Star, November 22, 2015 https://www.thedailystar.net/frontpage/two-hanged-together-176215

২৪. "পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক," অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা-৬৯

২৫. "পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক," অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা-৬৮

২৬. "পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক," অমলেন্দু দে, পৃষ্ঠা-৫০

২৭. Vested Property Act

২৮. Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act, PRIP Trust (2001)

২৯. "No Hindus will be left after 30 years", Dhaka Tribune, November 20, 2016.

৩০. "ভয় দেখালে ভারত চলে যাবে একারণে বাদলের অণ্ডকোষ কেটে দিয়ে যায়", নতুন সময়, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৯। https://notunshomoy.com/details.php?id=37114

৩১. ছিটমহল বিনিময়ের সময়ে ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশি ছিটগুলোর অধিবাসীরা সবাই ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ভেতরে থাকা ভারতীয় ছিট থেকে ৯৮৭ জন ভারতে চলে আসেন। এদের মধ্যে ১৫০ জন মুসলমান (সুত্র ঃ "The 2015 India-Bangladesh land boundary agreement: Identifying constraints and exploring possibilities in Cooch Behar", ORF occasional paper 2017, https://www.orfonline.org/research/the-2015-india-bangladesh-land-boundary-agreement-identifying-constraints-and-exploring-possibilities-in-cooch-behar/)

৩২. "Illegal immigrants from Bangladesh, a big problem: Government," The Economic Times, August 19, 2011. https://economictimes.indiatimes.com/nri/visa-and-immigration/illegal-immigrants-from-bangladesh-a-big-problem-government/articleshow/9661785.cms?from=mdr

৩৩. "Illegal Migration from Bangladesh: Deportation, border fences and work permits". Das, Pushpita. IDSA Monograph Series. No 56, December 2016. https://idsa.in/system/files/monograph/monograph56.pdf

৩৪. "Illegal immigration from Bangladesh to India: Towards a comprehensive solution", Sanjeev Tripathi, Carnegie India, June 29, 2016 https://carnegieindia.org/2016/06/29/illegal-immigration-from-bangladesh-to-india-toward-comprehensive-solution-pub-63931

৩৫. "PM Modi Assured Sheikh Hasina India Won't Deport NRC-excluded People to Bangladesh," News18, October 5, 2018. https://www.news18.com/news/india/pm-modi-assured-sheikh-hasina-india-wont-deport-nrc-excluded-people-to-bangladesh-1900203.html

৩৬. "Foreigners staying here can't be sent back as Bangladesh won't accept them: BJP's Assam ally," The Economic Times, December 4, 2019 https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/foreigners-staying-here-cant-be-sent-back-as-bangladesh-wont-accept-them-bjps-assam-ally/articleshow/72357904.cms?from=mdr

৩৭. "Several illegal Bangladeshis returning home," The Sunday Guardian, December 14, 2019. https://www.sundayguardianlive.com/news/several-illegal-bangladeshis-returning-home

প্রতিম বসু (প্রতিম রঞ্জন বোস) বিখ্যাত অর্থনৈতিক বিষয়ক সংবাদপত্র দ্য হিন্দু বিজনেস লাইন-এর ডেপুটি এডিটর। ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ এবং প্রখ্যাত প্রবন্ধ লেখক। বাংলা ও ইংরেজি—দুটি ভাষাতেই সব্যসাচী সাংবাদিকতায় জেফারসন পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত প্রতিম ভারতীয় চিন্তাবিদ্ মহলে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন আলোচনাচক্রে যুক্তিবাদী বক্তা হিসেবে সুপরিচিত।